জামাল হাসানের অপরিচিত ব্যক্তি ও ইতিহাস।

১। আবেগ ও ইতিহাস এক জিনিষ নয়। ইতিহাস হলো কষ্ঠি পাথরে নিরীক্ষিত মানুষরূপী বস্তুর কর্মকান্ডের স্বাভাবিক ঘটনাপ্রবাহের বিবরণ। মানুষ ব্যক্তিগত, শ্রেনীগত ও জাতিগত ভাবে হরেক রকম কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। ব্যক্তিগত, শ্রেনীগত ও জাতিগত ভাবে পরিচালিত ব্যক্তির কর্মকান্ডের দ্বারা ব্যক্তি, শ্রেনী ও জাতি উপকৃত ও অপকৃত হোতে পারে। ইতিহাসের কাজ হলো ব্যক্তির ঐ সকল কর্মকান্ড কষ্ঠি পাথরে নিরীক্ষা করতঃ জাতিগত ভাবে ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয় করা। একটা উদহারণ দেয়া যাক, বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয় মীর জাফরসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিকে নবাব সিরাজদৌলাহ রাজসভায় হরহামেসা অপমান করতেন এবং নারী সংক্রান্ত সামান্ততান্ত্রিক দোষ তার পুরামাত্রায় ছিল। বৃটিশ কর্তৃক লিখিত সমসাময়িক ইতিহাসে সিরাজের এই দোষগুলি প্রধান্য পেয়েছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দির প্রারাম্ভে অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতাকামি উঠতি বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত নিজ স্বার্থে নিজ অস্তিত্বের খোঁজে ১৭৫৭ সালের বাংলার আর্থ-সামাজিকসহ নবাব সিরাজদৌলাহকে পুণ-মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়। উক্ত মূল্যায়নের পরিপেক্ষিতে বাঙ্গালী কর্তৃক লিখিত ইতিহাসে সিরাজদৌলাহর দেশপ্রেম তার চারিত্রিক সকল দোষ মুছে দিয়ে বাংলার ইতিহাসে তাকে নায়কের এবং মীর জাফরকে ভিলেনের ভূমিকায় স্থান দিতে বাধ্য হয়।

ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে ইতিহাসের যথাস্থানে স্থাপনের জন্য তার ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল কর্মকান্ডই ইতিহাসের কাঠগোড়ায় সমালোচিত হওয়া প্রয়োজন। তবে নেতিবাচক সত্য হজম করা খুবই দুরূহ, তা যদি আবার সমকালীন ঘটনা সম্পর্কীয় ইতিহাস হয়। সমকালীন ঘটনার সাথে আমাদের অনেকেরই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে আবেগ ও স্বার্থ জড়িত। তাই সমকালীন ইতিহাস বিশ্লেষণে আমাদের অনেকের স্বার্থ ও আবেগ বিঘ্নিত হয় বিধায় প্রতিবাদ মুখর হই।

ফরিদপুর জেলার টুঙ্গিপাড়ার শেখ লুৎফর রহমানের ছেলে শেখ মুজিবুর রহমান তদকালীন পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শ্রেনীগত ভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেনীভুক্ত। আর এই মধ্যবিত্ত শ্রেনীর অধিকাংশ লোকই পুজিমুখী রাজনীতির ধারক ও বাহক। আওয়ামী

লীগ পুজিমুখী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমর্পিত একটি দল। কিন্তু ষাট দশকে আওয়ামী লীগের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। স্বার্থের কারণে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান বিভাজনে রাজী নয়। অন্যদিকে পাঞ্জাবী মুৎসুদ্দী পুজি বাঙ্গালী মধ্যবিত্তকে পুজির অংশীদারিত্ব দিতে নারাজ। তাই বাঙ্গালীর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শেখ মুজিবকে বামপন্থীদের সাথে হাত মিলাতে হয়। বামপন্থী সমার্থিত ৬-দফার স্বাধিকার আন্দোলন সকল শ্রেনী বাঙ্গালী কর্তৃক সমার্থিত হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন। তদকালীন পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত সকল মত, পদ, ধর্ম, শ্রেনী ও জাতিসত্বার মানুষেরা গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করে, তাকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট পদের ক্ষুদ্র গন্ডি থেকে উন্নত করতঃ সকল মত, পদ, ধর্ম, শ্রেনী ও জাতিসত্বার নেতার পদে, অর্থ্যাৎ ”বঙ্গবন্ধু” পদবীতে ভূষিত করে শেখ মুজিবুর রহমানকে কারো সন্তান, ব্যক্তি বিশেষের পিতা এবং কোন বিশেষ দলের প্রেসিডেন্ট থেকে মুক্ত করতঃ সর্বজনীন করা হয়। গণ-মানুষের ক্ষমতার মধ্যে এটাই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ সন্মান, যা জাতির পিতার চেয়ে সহস্র গুণ শ্রেষ্ঠ।

১৯৬৯ সালের ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের দাবী ১১-দফায় ছিল সকল মত, পদ, ধর্ম, শ্রেনী ও জাতিসত্বার অন্তর্ভূক্ত শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সনদ, যাতে বঙ্গবন্ধু ছিল অঙ্গীকার বদ্ধ। শ্রমজীবী মানুষের মুক্তি সনদে একাত্মতা প্রকাশের কারণেই ১৯৭০ সালের নির্বাচনে গণ-মানুষ বিপুলভাবে ভোট দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে জয়যুক্ত করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শে পাকিস্তানের সামরিক সরকার তদকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল মত, পদ, ধর্ম, শ্রেনী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্বাসহ বাঙ্গালীর একছত্র নেতা বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহন করে।

তদকালীন পাকিস্তান সামরিক সরকারের বিগত ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালো-রাতের ঘটনা দ্বি-জাতি তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান সৃষ্টির মোহ থেকে বাঙ্গালীকে মুক্ত করে দেয়। তদকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সকল মত, পদ, ধর্ম, শ্রেনী ও ক্ষুদ্র জাতিসত্বাসহ বাঙ্গালী তার নিজ জাতিয় সত্ত্বা, তার আবহমান কালের ধর্ম নিরপেক্ষতার চরিত্র, নিজ ভূখন্ডের শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি ও ১৯৪৭ সাল থেকে লালিত তার গণতন্ত্রের আকাঙ্খা, অর্থ্যাৎ বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তদকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সর্ব স্তরের মানুষ সর্বজনীন নেতা বঙ্গবন্ধুর নাম তার মানসপটে স্থাপন করে তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করে। জাতি সত্ত্বর টানে পুজিতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিশ্বাসী উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেনী যেমন মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছে, তেমনি জন সংখ্যার ৮০% বাংলার কৃষককুলও মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল। জগদ্দল পাথরের মতো তাদের ঘাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বিরাজমান কায়েমী স্বার্থবাদী গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামো ভেঙ্গে নুতন কাঠামো স্থাপনের স্বপ্ন নিয়েই কৃষককুল মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিল।

স্বাধীন বাংলাদেশের প্রত্যশা ছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনকারী সকল মত, পদ, ধর্ম, জাতিসত্ত্বা, শ্রেনী ও দল সমন্বয় জাতিয় সরকার গঠন করা। কিন্তু সর্বজনীন নেতা বঙ্গবন্ধুর চারপাশে অবস্থানরত উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেনীর পুজিবাদী ভাব ধারায় আস্থাবান আওয়ামী লীগ সদস্যদের পরামর্শে তিনি জাতিয় সরকার গঠন করলেন না। পাকিস্তান কর্তৃক ফেলে যওয়া শোষণ যন্ত্র প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন না করে দ্বি-জাতি তত্ত্ব ও শোষণে বিশ্বাসী প্রশাসনিক কর্মকর্তা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী স্বাধীন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কর্মকান্ড আরম্ভ করলেন। অর্থ্যাৎ শিয়ালের কাছে মুরগী বর্গা দিলেন। বঙ্গবন্ধুর আলোচ্য ব্যবস্থার প্রথম বলি মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী প্রগতিশীল তাজউদ্দীন আহম্মদ।

শহর আওয়ামী লীগের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর লুটেরা অংশের ব্যাংক লুট, মুৎসুদ্দী ব্যবসা ও পারমিটবাজীর কারণে সদ ব্যবসায়ীদের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করে ফলে জিনিষ-পত্রের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে এবং জন অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগের অংগ সংগঠন ছাত্র লীগ ও যুব লীগের দেশ প্রেমিক অংশ চলমান ব্যবস্থায় প্রতিবাদমূখী হয়ে উঠে এবং বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে ”জাতিয় সমাজতান্ত্রি দল” গঠন করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে উৎখাতের হটকারী কার্যক্রম গ্রহন করে।

স্বাধীনতার পর গ্রামীন ক্ষমতা কাঠামো পরিবর্তন না করায়, তাতে মুসলিম লীগের পরিবর্তে গ্রামীন আওয়ামী লীগ টাউটদের অনুপ্রবেশ ঘটে। ফলে সাধারণ গ্রামীন মানুষ টাউটদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। গ্রামীন সমাজকর্মীরা ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীরা প্রতিবাদ করায় তারা টাউটদের টার্গেটে পরিণত হয়। গ্রামীন

মানুষের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে শ্রেনী শত্রু খতমের নামে অতি বাম রাজনৈতিক কর্মীরা গ্রামীন পরিস্থিতি আরো জটিল করে তুলে।

শহর ও গ্রামীন গণ-অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বঙ্গবন্ধুকে অপসরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। লুটেরা শ্রেনীর সংবাদ পত্রিকাগুলি অনুদান হিসাবে ভর্তুকি মূল্যে নিউজ প্রিন্ট গ্রহন করে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে নেতিবাচক প্রচার আরম্ভ করে। সিআইএ, আই.এস.আই, জামাত, সামরিক-বেসামরিক আমলা, মুৎসুদ্দী পুজি ও আওয়ামী লীগের দক্ষিণ/ডানপন্থী ষড়যন্ত্রকারীরা জাসদের সাথে হাত মিলিয়ে বঙ্গবন্ধুকে অপসরণের চেষ্টায় লিপ্ত হয়।

উদ্ভূত পরিস্থিতি রাজনৈতিক ভাবে মোকাবেলা, প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে বাকশাল করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন ”চুরি আমার কৃষক-শ্রমিকরা করে না, চুরি করি আমরা ৫% শিক্ষিত লোক”। প্রশাসন ও ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে তিনি জেলা গভার্নর নিয়োগ দিয়েছিলেন। লুটেরা শ্রেনী ও দক্ষিণপন্থী ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের সমূহ বিপদ আঁচ করতে পেরে বঙ্গবন্ধু ও বাকশালের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র হত্যার প্রচার আরম্ভ করে এবং বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করতঃ ১৫ বছর সামরিক শাসন দ্বারা দেশ পরিচালনা করে। ষড়যন্ত্রকারী ও আলোচ্য ৫% লুটেরার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে গিয়াই তো বঙ্গবন্ধুকে জীবন দিতে হলো। তাই আজ শিক্ষিত ৫ শতাংশের সর্বগ্রাসী অবাধ লুটপাট এই জনপদে।

ষড়যন্ত্রকারী ও লুটেরা শ্রেনীর অপপ্রচার থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তকরার লক্ষ্যে তার সমালোচনা হওয়া বাঞ্ছণীয়। তার রাজনৈতিক বিভিন্ন দিক আলোচনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে তাকে সিরাজদৌলাহর মতো যথাযথ স্থানে স্থাপন করার দায়ীত্ব দেশ প্রেমিক প্রতিটি নাগরিকের। এখানে আবেকের কোন স্থান নাই।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরবর্তী সাড়ে তিন বছরের ঘটনা সমূহ সাধারণ মানুষের কাছে যত পরিষ্কার হচ্ছে ততোই দক্ষিণ/ডানপন্থী রাজনীতি ও লুটেরা শ্রেনীর চরিত্র উন্মোচিত হচ্ছে। ফলে দক্ষিণ/ডানপন্থী রাজনীতি মৌলবাদের দিকে ঝুঁকছে। মৌলবাদ প্রসারের জন্য তিনটি শর্ত পুরণ করতে হয়, যথাঃ- আন্তর্জাতিক শক্তির সমর্থন, বিপুল পরিমানের অর্থ এবং বাস্তবায়নকারী দেশে

মৌলবাদ প্রসারের যথোপযুক্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিরাজমানতা।

মধ্যপ্রাচ্য, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উত্তেজনা সৃষ্টি, নিজ অধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং মার্ক্সবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষ আদর্শ বানচাল করার লক্ষ্যে তদকালীন ঔপনিবেশিক শক্তি প্যালেষ্টাইনীদেরকে উৎখাত করে ধর্ম ভিত্তিক আধুনিক রাষ্ট্র ইস্রাইল ও আরব ভূখন্ডকে বিভাজন করে ফ্যানাটিক মুসলিম পরিবার কেন্দ্রীক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য এবং দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। সৃষ্ট এই রাষ্ট্র ও রাজ্যগুলি সরাসরি ভাবে ঔপনিবেমিক শক্তি দ্বারা শাসিত ছিল না। তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও রাজ্যগুলির শাসকবর্গ ঔপনিবেশিক শক্তির সাহায্য ও পরামর্শ নিয়েই নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল এবং বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাহায্য ও পরামর্শ নিয়ে ক্ষমতায় বিদ্যমান।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে পুরাতন ঔপনিবেশিক শক্তির পতনের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামের এক নব্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উত্থান ঘটে। ঔপনিবেশিক শক্তি তার কলোনী সমূহ ছাড়তে বাধ্য হলোও, বিভিন্ন কলোনীতে স্বার্থপর এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনী রেখে আসতে সমর্থ হয়, যারা আজ নিজ স্বার্থে নব্য সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থ রক্ষা করে চলছে। নব্য এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অস্ত্র ব্যবসার খাতিরে সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রতিপক্ষ হিসাবে উপস্থাপন করতঃ বিশ্ব-উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে স্নায়ু যুদ্ধের সূচনা করে। তৃতীয় বিশ্বের যে সকল দেশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে গণ বা সশস্ত্র আন্দোলন করে স্বাধীন হয়েছিল, সেই সকল দেশের ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট দেশের প্রগতিশীল সরকার সমূহকে উৎখাত করে সামরিক সরকার বসানো হয় এবং অর্থ যোগান দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের মৌলবাদকে উৎসাহিত করতঃ প্রগতিশীলদেরকে হত্যা করা হয়। উদহারণ, ইন্দোনেশিয়া, আলজেরিয়া ও বাংলাদেশ।

ইসলামি মৌলবাদের উৎসাহ দাতা হলো সাম্রাজ্যবাদ এবং অর্থ যোগানদার হলো সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক মধ্যপ্রাচ্যের ফ্যানাটিক মুসলিম পরিবার শাসিত রাজ্য সমূহ। আফগানিস্তানসহ মধ্যপ্রাচ্যের ট্রাইবেল পরিবার শাসিত রাজ্য সমূহে মধ্যযুগীয় ট্রাইবেল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা এখনো বিদ্যমান বিধায় ইসলামিক মৌলবাদ জন্মের উর্বর ক্ষেত্র হয়।

মধ্যযুগীয় ট্রাইবেল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা আফগানিস্তানে বিদ্যমান বিধায় মার্কিন উৎসাহে ও সাউদী আরবের অর্থে এবং পাকিস্তান সামরিক সরকারের সহযোগীতায় আফগানিস্তানে তালেবান সরকারের উত্থান ঘটেছিল। বিপরীতে আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশে ট্রাইবেল আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত। এই সকল দেশে শিক্ষিত এক বিরাট মধ্যবিত্ত শ্রেনীর উন্মেষ ঘটেছে, যারা ঔপনিবেশিক বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের মাধ্যমে নিজ দেশ স্বাধীন করেছে, সেই সকল দেশে একক ভাবে আফগানিস্তানের মতো মৌলবাদের ক্ষমতা দখল করা সম্ভব নয়। তবে ঐ সকল দেশের ক্ষমতা লোভী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের লুটেরা শ্রেনী নিজ স্বার্থে মৌলবাদকে ক্ষমতার অংশীদারিত্ব দিতে পারে। উদহারণ বাংলাদেশ। এটাই হলো ইতিহাসের শিক্ষা

সেতারা হাশেম ১১/১৮/০৫